দৈনিক সংবাদ

তারিখ 21 JAN 1997
পৃঃ ৪ কলাম ৭

ক্যাম্পাস রাজনীতি

কাজী তামান্না

আমাদের সময় ম্যাটিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আকাঙ্ক্ষা' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ্যবিষয় ছিল। প্রায় সত্তর বছর বয়সে একটি ছাত্র সম্মেলনে তিনি এই প্রবন্ধটি পাঠ করেন। প্রবন্ধের শুরুটা এরকম ''বৃদ্ধ সেজে আমি তোমাদের উপদেশ দিতে আসিনি, আমি শুধু এই কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে তোমরা নবীন। তোমরা যে বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছ সে বার্তা ভুললে চলবে না।'' তবে এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধের প্রতি ছত্রেই তিনি ছাত্রদের উপদেশ দিয়েছেন এবং কিভাবে ভূমাকে জানতে হবে এবং আকাঙ্ক্ষাকে বড় করতে হবে, সেই সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সেই ব্যাখ্যা এতই তাৎপর্যময় যে, আমার বিশ্বাস, যাঁরা ছাত্রাবস্থায় পাঠ্যবইয়ে এই প্রবন্ধটি পড়েছেন তাদের স্মৃতিতে এবং হৃদয়ে আজও তা অক্ষয় হয়ে আছে। এত বছর পর আমাদের সন্তানরা যখন নবীন এবং আমরা প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি, তখন বারবার ঐ প্রবন্ধটির কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে এই কারণে যে এখন যদি কোন বৃদ্ধ কবি, দার্শনিক অথবা সমাজের প্রাজ্ঞ কোন ব্যক্তিত্ব ছাত্র সম্মেলনে এমন গভীর প্রবন্ধ পাঠ করেন, তবে কি ছাত্ররা তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে? ভরসা পাইনা। এমন আয়োজনও এখন সেভাবে হয় না। রাজনীতি ছাড়া অন্য কিছু কি আলোচনা হয়? গণতন্ত্রের এই যুগে অন্যের দৃষ্টিভঙ্গি বা মতামতের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করাই যেখানে নীতি, সেখানে অন্যের মতামত, তা যতই যুক্তিপূর্ণ হোক না কেন, তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন ও ব্যক্তিটিকে অবলীলাক্রমে অপমান করা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কথাগুলো মনে হলো কিছুদিন পূর্বে আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব বর্তমান রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের একটি বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে। তিনি বামদলের নেতাদের সাথে একটি বৈঠকে আলোচনাকালে বিভিন্ন যুক্তি টেনে এনে বলেছিলেন, বর্তমানকালে ছাত্র রাজনীতি ও সন্ত্রাস যেভাবে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়েছে এবং যেহেতু সকল ছাত্র সংগঠনই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের মদদপুষ্ট এবং শত অপরাধ করলেও রাজনৈতিক দলগুলো তাদের বটবৃক্ষের মত রক্ষা করে ছায়া দেয়, তাই এই crisis অতিক্রম করতে হলে সাময়িকভাবে এই তথাকথিত ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেয়া ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এটা যে সাধারণ ছাত্রদের এবং সমাজের সবচেয়ে অসহায় সম্প্রদায় অভিভাবকবৃন্দের মনের কথা, তা বিভিন্ন কাগজে নানা লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু কিছুসংখ্যক ছাত্রনেতা ও রাজনীতিবিদ এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। এটা নাকি অমানবিক একটি প্রস্তাব, ছাত্রদের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেয়ার ফন্দি ইত্যাদি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে স্লোগান উঠেছে। নানা আপত্তি ও অপমানজনক বক্তব্যও এসেছে, ছাত্র রাজনীতি না থাকলে নব্বই–এর গণঅভ্যুত্থান হতো না, আর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন না হলে সাহাবুদ্দিন আহমদ রাষ্ট্রপতিও হতে পারতেন না। গণতন্ত্র কি আমাদের দেশের ছাত্র অথবা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে এই শিক্ষাই দেয়, 'দ্বিমত পোষণ করলেই অন্যকে, তা তিনি যেই হোন না কেন, অপমান করাই একমাত্র পথ।'

কোন সম্মানীয় ব্যক্তি যখন কোন একটি বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন, তখন সমস্ত যুক্তিকে পাশ কাটিয়ে তাকে সরলীকরণ করা উচিত বলে আমি মনে করি না। এখন দেখা যাক, বর্তমান সময় আমাদের দেশে ছাত্র রাজনীতির মাঝে সত্যি কি কোন নীতি আছে? রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন ছাত্র রাজনীতিকে যে 'তথাকথিত' বলেছেন, সেটা কি অসত্য? কথাটা তাঁর মনগড়া? তথাকথিত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো ''নামে মাত্র অথচ আসলে নয়''। ইংরেজিতে যাকে বলে Socalled। একটি ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা বহনকারী ছাত্র সমাজ এখন রাজনীতির নামে যে সমস্ত কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে, তাকে 'তথাকথিত' ছাড়া আর কি বা বলা চলে। রাষ্ট্রপতি যে এ সত্য কথাটা বলেছেন, তার জন্য তিনি অভিনন্দিত হবার যোগ্য। মুক্তিযুদ্ধোত্তরকালে এদেশের ছাত্র রাজনীতি নিয়ে কোন রকম বিতর্কের সৃষ্টি হয়নি। ছাত্ররা সমাজের শিক্ষিত একটি গোষ্ঠী, যাদের বয়স খুব বেশি নয়– সকলেই নবীন, সাধারণ বৈষয়িক কোন কিছু তাদের আকর্ষণ করে না। কোন পিছুটান থাকে না। সাহসী হতে বেগ পেতে হয় না। সারাক্ষণই টগবগ করে ফুটতে থাকে। তাই যেকোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে ছাত্রসমাজই এগিয়ে আসে। এ ছবিই আমরা বৃটিশ যুগ থেকে দেখে এসেছি। মৃত্যুকে তুচ্ছ করে শাসকগোষ্ঠীর যেকোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পাকিস্তান আমলেও এদেশের ছাত্রসমাজ কখনো পিছপা হয়নি। সমাজের সকল স্তরের মানুষ তাদের স্নেহ–ভালোবাসা দিয়েছে, শ্রদ্ধা করেছে। তখন যারা ছাত্র রাজনীতি করতেন, তারা সকলেই মেধাবী ছিলেন। স্বাধীনতার পূর্বেই যাদের ছাত্রাবস্থা শেষ হয়েছে এবং যারা এদেশের ছাত্র আন্দোলনের উজ্জ্বলতম সময় নিজেদের সক্রিয় রাখতে সক্ষম হয়েছিল, তাদের পক্ষে এখনকার ছাত্ররাজনীতির ধারাকে কোন অবস্থাতেই মেনে নেয়া সম্ভব নয়। এখনকার ছাত্রদের রাজনৈতিক হালচাল তাদের দুঃখিত ও ব্যথিত করে, মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ছাত্র রাজনীতির নিশ্চয়ই একটা সংজ্ঞা আছে। ছাত্র রাজনীতি করতে হলে প্রথমে তাকে ছাত্র হতে হবে। নিজেদের সমস্যার কথা একত্রিত হয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরাই ছাত্র রাজনীতির মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। যেহেতু ছাত্ররা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে শিক্ষিত সমাজ এবং বয়সে তরুণ তাই দেশের যেকোন সমস্যা তাদের সহজেই আলোড়িত করে। এই মানসিকতার প্রতিফলন আমরা দেখেছি বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের সময়। দেখেছি বাষট্টির আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে– উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সময় এবং আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে। ছাত্ররা এমন একটা অবস্থানে নিজেদের নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল যে, মায়েরা নিজ হাতে সন্তানকে যুদ্ধের সাজে সাজিয়ে রণাঙ্গনে পাঠাতে ইতঃস্তত করেনি। বিরাট যুবশক্তিকে এভাবে দেশের জন্য উৎসর্গ করতে পারা যে কত বড় অর্জন, তা কি যুদ্ধপরবর্তী সময় আমরা বুঝতে চেষ্টা করেছি? করিনি বলে আজ আমাদের এমন দেউলিয়া অবস্থা।

যুদ্ধ–পরবর্তী সময় এই ছাত্ররা সহসাই কেমন বদলে গেল। না, বদলে গেল না রাজনীতিবিদরা। হাতে ধরে আমাদের যুবশক্তিকে নিজেদের স্বার্থে ধীরে ধীরে উৎসের দিকে নিয়ে গেল। কোন কোন ছাত্রদলের সাথে জাতীয় রাজনৈতিক দলের একটা যোগসূত্র ছিল এটা সত্যি; কিন্তু ছাত্ররা স্বাধীনভাবেই তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারতো। রাজনৈতিক নেতারা তাদের ব্যবহার করতে পারিনি। সুস্থ রাজনীতি ও মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ যে বিরাট ছাত্রসমাজকে দেশগড়ার কাজে নিয়োজিত করা যেত সেই যুবশক্তিকে দলীয় কারণে রাজনীতিবিদরা ভুলভাবে চালিত করতে কুণ্ঠাবোধ করে নি। এমন প্রাণবন্ত সৃষ্টিধর্মী যুবসমাজের এমন অবনতি পৃথিবীর আর কোন দেশে হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। পাকিস্তান আমলে ষাট দশকের শেষ দিকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান এন, এস, এফ গঠন করে ছাত্রসমাজকে কলংকিত করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বৃহত্তর ছাত্রসমাজ তাদের প্রতিহত করতে পেরেছিলে। আর স্বাধীনতার পর সেই ছাত্ররা কেমন অনায়াসে অস্ত্র হাতে তুলে নিল। ক্রমশ ছাত্রনেতারা মানুষের শ্রদ্ধা হারিয়ে সকলের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ালো। চুয়াত্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসিন হলের চত্বরে সাত ছাত্রকে সকলের সামনে হত্যা করে ছাত্রনেতাদের কেমন বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখলাম আমরা। যে ছাত্ররা অকুতভয়, মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করতে গিয়েছিল তারাই অনায়াসে ডাকসুর নির্বাচনের পর ব্যালট বাক্স চুরি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে নিয়ে যেতে সক্ষম হলো। তারপর পঁচাত্তরের পট পরিবর্তনের পর আজ পর্যন্ত ছাত্র রাজনীতি বলতে যা বোঝায় তা কি তারা করেছে? নব্বই–এর এরশাদবিরোধী আন্দোলনে যদিও ছাত্ররা ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিল; কিন্তু বিএনপি'র রাজত্বকালে বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতির নামে যে অরাজকতা চলেছে তাতে কোন বাবা–মাই কামনা করেননি তাদের সন্তানেরা ছাত্র রাজনীতি করুক। উপরন্তু বাবা–মায়েরা সবসময় সন্তানদের শিক্ষাঙ্গনে পাঠিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত থেকেছেন কখন কি হয়। কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাসের পর মাস বন্ধ থেকেছে একেকটা সন্ত্রাসী কার্যকলাপের পর। চার বছরের কোর্স শেষ করতে আট বছর সময় লেগেছে। নিজের দলের কেউ নিহত বলে সেই রাজনৈতিক দলের নেতারা তাদের ক্যাডার বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছে, আর অন্য দলের হলে তাকে সন্ত্রাসী বলে ঘৃণা করেছে। কিন্তু যে মায়ের কোল খালি হয়েছে তার কাছে তো সন্তান ছাড়া সে আর কিছুই নয়। এখন যারা ছাত্র রাজনীতি করে তাদের সবাই কি ছাত্র? এখন তো ডাকসু'র নেতাদের অধিকাংশই অছাত্র। তাদের কেউ কেউ জাতীয় রাজনীতিতে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছেন। সাংসদও হয়েছেন। তারা কি জাতীয় রাজনীতি না ছাত্র রাজনীতি করছেন আমরা ঠিক বুঝতে পারি না। আমরা শুধু দেখি ছাত্র রাজনীতি বলতে এখন বোঝায় চাঁদাবাজি, হল দখল আর এসব করতে হরহামেসা মারামারি খুনোখুনি লেগেই আছে। সকল বড় দলেরই গডফাদার আছে। তাদের ছত্রছায়ায় ছাত্রনেতারা যেকোন কুকীর্তি করে পার পেয়ে যায়। ছোট ছাত্রদলগুলো হয়তো মাঝে মাঝে ন্যায্য দাবি নিয়ে আন্দোলন করার চেষ্টার করে; কিন্তু তরী আর ভিড়তে পারে না। এই যে দিনের পর দিন ছাত্র রাজনীতির নামে শিক্ষালয়গুলো ধ্বংসের মুখোমুখি হচ্ছে, ছাত্ররা সন্ত্রাসীতে পরিণত হচ্ছে, শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে, খামোখা মায়ের কোল খালি হচ্ছে, সন্ত্রাসীদের কারণে সেশনজটের সৃষ্টি হচ্ছে, একটি যুবশক্তির অপচয় হচ্ছে, এর কি কোন প্রতিকার নেই? আমরা খালি হা–হুতাশ করবো? আর নীরবে সব অবলোকন করবো। আমি মনে করি আমাদের দেশের সমস্ত রাজনীতিবিদ, বড় বড় আমলা, ব্যবসায়ী, মন্ত্রী বাহাদুরদের সন্তানরা যদি এদেশেই উচ্চশিক্ষা নিতেন তবে সমস্যার কিছুটা হলেও সমাধান হতো। কারণ যাকে কখনো সাপে কাটেনি সে বিষের কি ব্যথা তা বুঝতে পারে না। যারা এদেশের ছাত্র রাজনীতির সুতোটা ধরে ছাত্রদের যেমন খুশি নাচাচ্ছেন তাদের প্রায় কারোর সন্তানই এদেশে লেখাপড়া করে না। সুতরাং শিক্ষা ধ্বংসের পথে গেলে তাদের কিছুই এসে যায় না। আমরা চাইলেই তো আর তারা তাদের সন্তানদের ভালো শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করবেন না। একথাও অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, বর্তমান সময় অধিকাংশ শিক্ষকই ছাত্রের ওপর তাদের যে দায়দায়িত্ব আছে তা পালন করেন না। তার ওপর অধিকাংশ শিক্ষক নিজেরাই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করেছেন, যা সর্বজনবিদিত। সিনেটের নির্বাচনে তারা নীল, সাদা বা গোলাপীর আবরণে তা প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন না। এটা তো খুব স্বাভাবিক যিনি যে দল করেন সেই দলের ছাত্রদের প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব থাকবেই। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা পর্যন্ত পক্ষপাতিত্বহীনভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে অপারগ হচ্ছেন। এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে! শিক্ষাকে অবশ্যই দলীয় রাজনীতির কবল থেকে মুক্ত করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যারা সোজাসুজি যুক্ত, বিশেষত যারা শিক্ষক, তাদেরও এ বিষয়ে একটা বিশেষ দায়িত্ব স্বীকার করে নেয়া উচিত।

শিক্ষক যদি শিক্ষায়তনের ভেতর দলীয় আজ্ঞা অনুযায়ী চলেন, দলের স্বার্থকেই গুরুত্ব দেন তবে তার পক্ষে স্বাধীনভাবে শিক্ষা দেয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। শিক্ষকের শিক্ষার স্বধর্ম অনুসারী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে আমরা অনেকে বলে থাকি সমাজের সর্বস্তরে যখন এত অন্যায়, কেউই যখন তাদের কর্তব্য করছেন না তখন শিক্ষকদের কাছ থেকেই বা আমরা কেন আদর্শের নামে কিছু আশা করবো। কথাটার মধ্যে কিছু মিথ্যা নেই। তবু মাতৃত্বের যেমন দায় আছে তেমনি ছাত্রদেরও দাবি আছে শিক্ষকদের কাছ থেকে কিছু আদর্শের কথা শুনবার, কিছু আদর্শনিষ্ঠার সাথে পরিচিত হবার। সেই অধিকারকে শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে শিক্ষকবৃন্দ যদি কখনো যথাসাধ্য কাজ করতে সম্মত হন তবে অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষালয়ের সমস্যার কিছুটা সমাধান আশা করা যায়।

আমাদের দেশে এই মুহূর্তে শিক্ষায়তনে সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার সবচেয়ে বড় উপায় হলো ছাত্র রাজনীতি থেকে জাতীয় রাজনীতির অভিভাবকত্ব তুলে নেয়া এবং কঠোর হাতে ক্যাম্পাসকে অস্ত্রমুক্ত করা। কিন্তু বাস্তবে এটা যে অসম্ভব তা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং বিকল্প পথ হিসেবে এখন মাত্র যে পথটা খোলা আছে তা হলো সাময়িকভাবে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেয়া। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দিলে সমস্যার সমাধান যে হবেই এমন গ্যারান্টি দেয়া যায় না। কিন্তু একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি। পূর্বের সকল গণআন্দোলনে ছাত্রদের ইতিবাচক ভূমিকা ছিল বলে ছাত্র রাজনীতি করতেই হবে এমন যুক্তির মধ্যে ভালো কিছু নেই। অনেকেই এমন কথাও বলে থাকেন মাথা ব্যথার কারণে মাথা কেটে ফেলা চিকিৎসা ব্যবস্থার পদ্ধতি হতে পারে না। কিন্তু শরীরের কোন অঙ্গে পচন ধরলে তা কেটে ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ। তা না হলে সর্বশরীরেই পচন ধরার আশংকা থেকে যায়। আর মাথা ব্যথা যদি মস্তিষ্কের টিউমারের কারণে হয়ে থাকে তবে তো সেই টিউমার কেটে ফেলা ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকে না। তা না হলে তো রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তাই বলছি, যেহেতু এই মুহূর্তে ছাত্র রাজনীতি থেকে সন্ত্রাসকে আলাদা করা যাচ্ছে না তখন এর চিকিৎসা মেডিসিনে হবে না, সার্জারির আশ্রয়ই নিতে হবে। আর এখন প্রায় সকল অভিভাবকই যখন নিজ সন্তানকে ছাত্র রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখার পক্ষপাতী। তখন অন্যের সন্তানকে সেদিকে ঠেলে দেয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কি।